ড. হাসান রুহানীর সাথে কিছুক্ষণের স্মৃতি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 29 September 2013 21:56 - Last Updated Sunday, 29 September 2013 22:34

ড. হাসান রুহানী আজ ইরানের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। নানা কারণে তিনি আজ বিশ্বের বহু আলোচিত ব্যক্তি। ক’দিন আগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিয়ে তিনি আলোচনার শীর্ষবিন্দুতে পৌছে গেছেন। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার সাথে টেলিফোন সংলাপের মধ্য দিয়ে ইরান-মার্কিন সম্পর্কে এতকাল যে বিচ্ছেদ ছিল সে ক্ষেত্রে নতুন সংযোগ গড়েছেন। ইরানে অবস্থান কালে আমার বিরল সুযোগ মিলেছিল জনাব রুহানীর সাথে প্রায় ৫-৬ ঘন্টা কাটানোর। সে স্মৃতি ভূলবার নয়। সে স্মৃতির বহুকিছু শুধু বিস্ময়করই নয়, শেখবারও।তাঁর সাথে সাক্ষাতের ফলে সুযোগ মেলে সে সময় যারা বিপ্লবের কান্ডারি ছিল তাদের চিন্তা-চেতনা সাথে কিছু পরিচয় লাভের। তখন উনার বয়স বত্রিশ। সময়টা ছিল ১৯৮০ সালের জুন মাস। আমি সবেমাত্র ইরানে এক সরকারি জেলা হাসপাতালে চিকিৎস্যক রূপে যোগ দিয়েছি,বিপ্লবের বয়স তখন এক বছর চার মাস। মহম্মদ রেজা শাহ পাহলভি ইরান ছেড়ে পলায়ন করে ১৯৭৯ সালের ১৬ই জানুয়ারিতে।তার পলায়নের পর পরই আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী বহু বছরের নির্বাসন শেষে প্যারিস থেকে তেহরানে ফিরে আসেন। ফেব্রেয়ারি মাসের ১১ তারিখে শাহের সমর্থণপুষ্ট শাহপুর বখতিয়ার সরকারের পতন ঘটে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় ড.মেহেদী বাজারগানের নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার।

আমি ইরানে পৌছি ১৯৮০ সালের মে মাসে। ইরানের আজকের প্রেসিডেন্ট জনাব ড. হাসান রুহানী তখন মজলিশে শুরার সদস্য। ইরানীরা পার্লামেন্টকে বলে মজলিশে শুরা অর্থাৎ পরামর্শ সভা। আমার কর্মস্থল তেহরান থেকে ১০৫ মাইল পূর্বে গরমসার নামক একটি জেলার জেলা হাসপাতালে। গরমসার সেমনান প্রদেশের পূর্বাঞ্চলীয় একটি জেলা শহর। ড.হাসান রুহানী তখন সেমনান জেলার এমপি।৫ বার তিনি সে পদে নির্বাচিত হয়েছেন;১৯৮০ সাল থেকে ২০০০ সাল অবধি ২০ বছর যাবত তিনি মজলিশে শুরার সদস্য ছিলেন।চতুর্থ ও পঞ্চম মেয়াদ কালে তিনি পার্লামেন্টের ডিপুটি স্পীকারও ছিলেন। আমি আমার ইরানে কর্মজীবনের পুরা ১০টি বছর কাটিয়েছি গরমসার জেলাতে। এত দীর্ঘকাল একই জেলাতে ডাক্তার রূপে কাজ করার ফলে জেলার সর্বস্তরের মানুষের সাথে গড়ে উঠে ব্যাপক পরিচিতি। অনেকের সাথে গভীর বন্ধুত্বও গড়ে উঠে। ভেড়ার রাখাল থেকে শুরু করে সাধারণ কৃষক,শিক্ষক,ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, জুম্মার ইমাম, এমপি, ধর্মীয় ও রাজনৈতীক নেতাকর্মীদের সাথে পরিচিতিও গড়ে উঠে। সুযোগ মেলেছে বহু বামপন্থি, শাহপন্থি, মোজাহিদীনে খালকের ন্যায় প্রচন্ড বিপ্লব বিরোধীদের সাথে কথা বলারও। এরা আমার কাছে এসেছে রোগী হিসাবে। এদের অনেকের বাসায় মেহমান রূপেও বহুবার আমন্ত্রিত হয়েছি।

বিদেশী হওয়ার কারণে এরা আমার সাথে কথা বলতো নির্ভয়ে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ডাক্তারি পেশার এটি এক বাড়তি সুবিধা। এ পেশায় নানা স্তরের মানুষের সাথে মেলামেশায় কোন প্রাচীর থাকে না। বিলেতেও সেটি অনুভব করি। শুধু দেহের কথাই নয়, মনের কথাও তারা নির্ভয়ে বলে। ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় থেকে চাকুরির প্রস্তাব পাওয়ার সাথে সাথে আমি ফার্সি ভাষা শেখায় তাড়াহুড়া শুরু করে দেই। তখন দুশ্চিন্তা ছিল ফার্সি না জানলে আমি রোগীদের সাথে কথা বলবো কি করে? তাদের রোগই বা জানবো কি করে? ইরানে পৌছার পর ফার্সি ভাষা শেখার সে আগ্রহটা আরো তীব্রতর হয় ফারসী সাহিত্য ও ইরানের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সে দেশের বুদ্ধিজীবীদের লেখালেখির সাথে পরিচিতি লাভের জন্য। কারণ পত্র-পত্রিকা হলো জাতির চিন্তা-চেতনার প্রতিচ্ছবি। সেখানে সন্ধান মেলে একটি দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতীক কর্ণধারগণ দেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে নিয়ে কি ভাবছেন তার পরিচয়। তাই কোন দেশের মানুষের মন ও মনন এবং

1 / 10

ড. হাসান রুহানীর সাথে কিছুক্ষণের স্মৃতি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 29 September 2013 21:56 - Last Updated Sunday, 29 September 2013 22:34

তাদের রাজনৈতীক অভিলাষের খোঁজখবর পেতে হলে সে দেশের পত্র-পত্রিকা পাঠের বিকল্প নেই। তাছাড়া মুসলিম জগতে আরবীর পরই ফার্সি হলো দ্বিতীয় সমৃদ্ধ ভাষা। তাই যতদিন ইরানে ছিলাম ততদিন চেষ্টা করেছি ফার্সি ভাষা শেখার।ফার্সিতে কথা বলায় প্রথম তিন-চার মাস সমস্যা হলেও পরে আর সে সমস্যা থাকেনি। তাছাড়া ফার্সি ভাষাটি অতি সহজ,উর্দু জানা থাকলে সেটি আরো সহজ হয়ে যায়। কারণ এ দুটি ভাষার শব্দভান্ডারে রয়েছে বহু হাজার অভিন্ন শব্দ। ফার্সি বহু শত বছর ভারতের রাষ্ট্র ভাষাও ছিল। বহু ফার্সি শব্দ বাংলা ভাষাতেও রয়েছে। ফারসী জানা থাকলে সহজ হয়ে যায় আরবী ভাষা শিক্ষাও। কারণ ফার্সির প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ শব্দই আরবী ভাষা থেকে নেয়া। ইরানে পৌঁছার কিছু দিনের মধ্যেই আমি ফার্সি দৈনিক পত্রিকা পড়া শুরু করে দেই। কারণ আধুনিক ভাষা শেখার এটিই সবচেয়ে সফল উপায়। শিক্ষাসূত্রে লাহোরে থাকা কালে আমি উর্দু ভাষা শিখি এ পত্রিকা পড়েই। আর ভাষা হলো মানুষে মানুষে মনের সংযোগের সবচেয়ে সুন্দর বাহন। অন্যভাষীরা খুব খুশি হয় যখন অন্যদের তাদের ভাষায় কথা বলতে দেখে। তখন তারাও মনের দরজা খুলে দেয়। ফলে সহজ হয় তাদের মনের অতি কাছাকাছি পৌঁছার।

গরমসার জেলাটি একটি ক্ষুদ্র ও জনবিরল জেলা হলেও এ জেলার মানুষেরা অন্য জেলাবাসীর তুলনায় নিজেদেরকে চালাক-চতুর বা বুদ্ধিমান মনে করে। এবং তা নিয়ে গর্বও করে। সম্ভবত তার কিছু কারণও রয়েছে। শিক্ষাদীক্ষাতে এ জেলাবাসীরা অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর। এ জেলার বহু শিক্ষিত মানুষ অন্য জেলায় গিয়ে শিক্ষাকতা করেন। বিশ্ববিদ্যাদয়ের শিক্ষক বা নামকরা ডাক্তার উঠে এসেছে গ্রাম থেকে।ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. আহমেদী নেজাদও এ জেলারই এক ক্ষুদ্র গ্রামের সন্তান। গরমসারের অবস্থান ইরানের সবচেয়ে বড় মরুভূমি “দাশতে কবীর”এর উত্তর ভাগে। ফারসীতে “দাশত” বলতে বুঝায় প্রান্তর,মাঠ বা ক্ষেত্র। “কবীর” অর্থ বড় বা বিশাল। মরুভূমির পাশে অবস্থান হওয়ায় জেলার আবহাওয়া গ্রীষ্মকালে হয়ে পড়ে অত্যন্ত গরম; ইয়ার-কুলার বা ইয়ার-কন্ডিশনার ছাড়া ঘরে বসবাস করাই কঠিন। কিন্তু শীত কালে আবার প্রচন্ড শীত, মাঝে মধ্যে বরফে ঢেকে যায়।গরমসার শহর থেকে প্রায় ১১০ মাইল পূর্ব দিকে হলো প্রাদেশিক শহর সেমনান। গরমসারের অবস্থান সেমনান ও তেহরানের প্রায় মাঝামাঝিতে। সেমনান প্রদেশের পূর্বে প্রসিদ্ধ খোরাসান প্রদেশ এবং উত্তরে বিশাল আল বোরজ পর্বতমালা এবং পর্বতের ওপারেই কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী নয়নাভিরাম মাজেন্দারান প্রদেশ। আর পশ্চিমে হলো কেন্দ্রীয় প্রদেশ তেহরান। গরমসার জেলাটি বিখ্যাত উন্নত মানের খোরবুজা, ডুমুর,আনার ও তুলা উৎপাদনের জন্য। ১৯৯০ সালে ইরান থেকে চলে আসার জানতে পারি জেলার দক্ষিণ ভাগে বড় ধরণের একটি বিমান ঘাঁটি নির্মিত হয়েছে।

ড. রুহানীর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে তাঁর সাথে আমার কোন পরিচিতি ছিল না। তার নামও আগে শুনেনি। ড. হাসান রুহানীর সাথে প্রায় ৫ -৬ ঘন্টা কাটানো কালে আদৌ বুঝতে পারিনি এ ব্যক্তিটি ইরানের প্রেসিডেন্ট হবেন এবং ইতিহাসে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা পাবেন। সেরূপ ধারণা না থাকায় হয়তো ভালই হয়েছে। কারণ, সেরূপ ধারণা থাকলে হয়তো আমাদের কয়েক ঘন্টার আলোচনা এতটা খোলামেলা ও স্বাভাবিক হতো না। আমাদের আলোচনা হয়েছিল একই সমতলে, কে কত বড় তা নিয়ে অন্তত আমার মনে কোন ধারণাই আসেনি। হয়তো তার মনেও নয়। সম্ভবত সে কারণে আমি যেমন উনার সাথে নিঃসংকোচে কথা বলেছি, তেমনি উনিও বলেছেন। সেদিন উনার মাঝেও কোনরূপ কৃত্রিমতা বা অহংকার দেখিনি। ক’দিন আগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফার্সিতে দেয়া তাঁর ভাষণটি মনযোগ সহকারে শুনলাম। বহু দেশের বহু প্রেসিডেন্ট এবং বহু প্রধানমন্ত্রীই জাতিসংঘে ভাষন দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ওবামাও দিয়েছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে এবার সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে ড. রুহানীর ভাষণ। আল জাজিরা তারা পুরা ভাষণটি প্রচার করেছে। শুধু আল জাজিরা

2 / 10

ড. হাসান রুহানীর সাথে কিছুক্ষণের স্মৃতি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 29 September 2013 21:56 - Last Updated Sunday, 29 September 2013 22:34

নয়, বিবিসিসহ বিশ্বের নানা গুরুত্বপূর্ণ টিভি চ্যানেল তাঁর ভাষণের উপর বিভিন্ন রাজনৈতীক বিশেষজ্ঞদের মন্তব্যও প্রচার করেছে। সবাই এ ব্যাপারে একমত যে প্রেসিডেন্ট রুহানীর বক্তৃতার মাঝে ছিল কুটনীতি-সুলভ প্রজ্ঞা ও রাষ্ট্রনায়ক-সুলভ দুরদৃষ্টি যা সাবেক প্রেসিডেন্ট আহমেদী নেজাদের বক্তৃতায় থাকতো না। জনাব আহমেদী নেজাদের আগে আয়াতুল্লাহ রাফজানজানি ও মুহাম্মদ খাতেমী যখন ইরানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন ড. রুহানী ছিলেন তাঁদের ইরানের সেক্যুরিটি বিষয়ক পরামর্শদাতা। ইরানের পারমানবিক অস্ত্র নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানী -এ তিন ইউরোপীয় দেশের সাথে তিনিই ইরানের পক্ষ থেকে বৈঠক করতেন। ১৯৮৯ সাল থেকে ২০০৫ সাল অবধি ১৬ বছর যাবত তিনি ছিলেন ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিক্যুরিটি কাউন্সিলের সেক্রেটারি।

ড. রুহানীর সাথে আমার সাক্ষাতের একটি ক্ষুদ্র পঠভূমিকা আছে। ইরানে আমার অবস্থান তখন একমাসও হয়নি। সে সময় কিছু প্রয়োজনীয় কাজে আমাকে সেমনান প্রদেশের হেলথ ডাইরেক্টরের অফিসে যেতে হয়। কাজ সেরে বিকেলে বাস যোগে কর্মস্থলে ফেরার চিন্তা করছি। এমন সময় আমার এক ইরানী বন্ধু বল্লেন, “বারাদার (ভাই), আমাদের শহরের এমপি সাহেব এখনই তেহরানের দিকে রওয়ানা দিচ্ছেন। আপনি বাসে না গিয়ে উনার গাড়ীতে যান। উনার গাড়ীতে জায়গাও আছে।” পরামর্শটি আমার জন্য খুবই ভাল মনে হল। সময় মত বাস পাওয়ার ঝামেলা বড় ঝামেলা। সেমনান থেকে গরমসারের কোন বাস সার্ভিস নাই। বাস নিতে হয় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত উঁচিয়ে দূরপাল্লার চলন্ত বাস থামিয়ে। অনেক সময় ঘন্টা খানেক লেগে যেত এরূপ চলন্ত বাসে জায়গা পেতে। সাধারনত এ বাসগুলো মাশহাদ, নিশাপুর, সবজাভার বা অন্যান্য দূরবর্তী শহর থেকে সেমনান ও গরমসারের পথ ধরে তেহরানমুখী ছুটতো। ফেরার পথে এমপি’র জিপে জায়গা হবে সেটি ছিল আমার জন্য খুবই আনন্দের বিষয়।তবে আমার কাছে আনন্দের মূল কারণটি শুধু বাস পাওয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া নয়, বরং একজন এমপি’র সাথে কিছু সময় কাটানোর।

আমার ইরানী বন্ধুটিই আমাকে এমপি সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইরানে পৌছানোর পর যে কয়েক ইরানীর সাথে আমার পরিচয় ঘটে সে তাদেরই একজন। ড. রুহানী সাহেব তাঁর স্ত্রী ও বাচ্চাদের নিয়ে তেহরান যাচ্ছেন। বাচ্চা নিয়ে তাঁর স্ত্রী বসলেন পিছনের ছিটে। এমপি সাহেব এবং আমি বসেছি মাঝের সারিতে। চেহরাসুরত ও লেবাস দেখে বুঝতে বাঁকি থাকলো না তিনি একজন আলেম। তাঁর চেহারায় তখনও তারুন্য ও মুখে মিষ্টি হাঁসি। মাথায় শিয়া আলেমদের ন্যায় পাগড়ী। তিনি আমার সাথে ইংরাজীতে কথা বলা শুরু করলেন। উচ্চারন আমেরিকান এ্যাকসেন্টের এবং সুন্দর বিশুদ্ধ ইংরাজী। বিস্মিত হলাম,একজন আলেম এরূপ ইংরেজী শিখলেন কোত্থেকে? ভাবলাম,আমাদের দেশের ক’জন আলেম এরূপ ইংরেজীতে কথা বলতে পারেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারিরাই বা ক’জন পারেন? তাদের অনেকে তো শুদ্ধ বাংলাও বলতে পারেন না। যাহোক যাত্রা পথে আমাদের আলোচনায় মাঝে ভাষার আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলো না। সেমনান থেকে গরমসার প্রায় দুই ঘন্টার যাত্রাপথ। কিন্তু সে দুই ঘন্টায় মাঝে আমাদের আলোচনায় সম্ভবত দুই মিনিটও ছেদ পরিনি। ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি জ্ঞানের অন্যান্য রাজ্যেও যে তার পদচারণা আছে সেটি সেদিন সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম।

3 / 10

ড. হাসান রুহানীর সাথে কিছুক্ষণের স্মৃতি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 29 September 2013 21:56 - Last Updated Sunday, 29 September 2013 22:34

আমাদের আলোচনার কোন নির্দিষ্ট বিষয় ছিলনা। আলাপ হচ্ছিল নানা বিষয়ে। বিশেষ করে বিপ্লব পরবর্তী অবস্থা ও ইরানের সমস্যা নিয়ে। কথা হচ্ছিল বাংলাদেশের সমস্যা নিয়েও। আলাপ হচ্ছিল মুসলিম বিশ্বের অনৈক্য, সাম্রাজ্যবাদের গোলামী ও পশ্চাদপদতা নিয়ে। কথা হচ্ছিল বিপ্লব বিরোধীদের এজেন্ডা নিয়েও। তিনি প্রচন্ড অমায়ীক ও মিষ্টভাষী। মনে হয়েছিল তিনি একজন ভাল মানের বুদ্ধিজীবীও। তিনি সেমনান শহরের এমপি হলেও তার পৈত্রীক নিবাস সেমনান থেকে প্রায় ১৫ মাইল দূরর সোরখে নামক এক ছোট্ট শহরে। এ শহরটি সেমনান থেকে তেহরান যাওয়ার যাত্রা পথেই পরে। সোরখে শহরটি দেখে মনে হয় এটি মরুদ্যান। গাছপালাহীন দীর্ঘ ধূসর মরুভূমি অতিক্রম কালে এ শহরটি তার সবুজ গাছপালা,ক্ষেতখামার আর ঘরবাড়ি নিয়ে পথের মাঝে হটাৎ করে হাজির হয়। তখন মনটাও যেন রুক্ষ ভাব থেকে হটাৎ জেগে উঠে। সবুজের স্পর্ষে মানুষের মন যে কতটা প্রবল আবেগে আন্দোলিত হয় সেটি এরূপ মরুদ্যানগুলো দেখলে বুঝা যায়। সম্ভবত ইরানের এরূপ মরুদ্যানগুলোতেই সেদেশের বিখ্যাত কবিদের জন্ম। বায়ুর মাঝে বসবাসে বায়ুর কদর বুঝা যায় না, তেমনি ছায়া ঢাকা,পাখি ডাকা সবুজ শ্যামল দেশে যাদের বসবাস তারাও প্রকৃতির অপরূপ রূপ দেখে এতটা পুলকিত হয় না। কিন্তু মরুভূমির দেশে প্রতিটি বৃক্ষ,প্রতিটি ফুল ও ফল,প্রতিটি গুল্মলতা এবং প্রতিটি ঝরণা অপরূপ সাজসজ্জা ও অলংকার মনে হয়।পবিত্র কোরআনে জান্নাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহতায়ালাও তাই সেগুলির বর্ণনা বার বার পেশ করেছেন। পবিত্র কোরআনের সে বর্ণনায় মরুবাসী আরবগণ যে দারুন ভাবে আন্দোলিত হতো তা নিয়ে কি সন্দেহ আছে? সেটি আমি নিজ মনে তীব্রভাবে প্রথম অনুভব করেছি যখন গরমসারের রুক্ষ কর্মস্থল ছেড়ে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা কাস্পিয়ান সাগর উপকূলবর্তী গিলান বা মাজেন্দারান প্রদেশে বেড়াতে গেছি। সে এক তীব্র অনুভূতি।

ইরানের সর্ববৃহৎ মরুভূমি দাশতে কবীরের বিশাল উত্তর ভাগ জুড়ে সেমনান প্রদেশ। এ প্রদেশের আর দুটি জেলা হলো দমঘান ও শাহরুদ। দমঘান বিখ্যাত পেস্তা উৎপাদনের জন্য। এ দাশতে কবীরের তাবাস’য়েই ১৯৭৯ সালে কয়েকটি মার্কিন হেলিকপ্টার তার আরোহী কমান্ডোদের নিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল। এ ঘটনাটি ঘটে আমার ইরানে পৌছার আগেই। পত্রিকায় দেখিছি বিধ্বস্ত হেলিকপ্টার ও তার দগ্ধ আরোহীদের বীভৎস ছবি। জিমি কার্টার তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। ইরানী ছাত্রদের হাত থেকে দূতাবাসের জিম্মি মার্কিনীদের উদ্ধারের লক্ষ্যে এটি ছিল মার্কিন
প্রশাসনের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এটি ব্যর্থ হওয়ায় কার্টারের দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনী বিজয়টিও ব্যর্থ হয়ে যায়। তিনি বিপুল ভোটে পরাজিত হন রোনাল্ড রেগানের কাছে।

ড. রুহানী বল্লেন, চলার পথে তিনি তাঁর সোরখের পৈত্রিক বাড়ীতে কিছুক্ষণের জন্য থামবেন। আমাকেও অনুরোধ করলেন,

আমিও যেন কিছুক্ষণ বসি। তার পিত্রালয়ের গৃহটি কাদামাটির

এবং অনেক কালের পুরনো। কোন বিলাসিতা নেই। কোনরূপ

চাকচিক্য বা জাঁকজমকও নেই। নেই কোন টেবিল চেয়ার বা

সোফাসেট। মেঝেতে দেয়াল থেকে দেয়াল অবধি কার্পেট। এমন

4 / 10

ড. হাসান রুহানীর সাথে কিছুক্ষণের স্মৃতি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 29 September 2013 21:56 - Last Updated Sunday, 29 September 2013 22:34

কার্পেটই ঘরের চেহারা পাল্টে দেয়। আমি গ্রামের কৃষকের বাড়ীতেও এমন কার্পেট দেখিছি। কোন চেয়ার টেবিল নেই। দেয়ালের সাথে লাগোয়া ঠ্যাস-বালিশ। ফার্সিতে বলে পুশতি। পুশত হলো মানুষের পিঠ। এ বালিশগুলোতে পিঠ ঠ্যাকানো হয় বলেই হয়তো বলা হয় পুশতি। সবাই দেয়াল ঘেষে কার্পেটের উপর বসে। ইরানে যত বাড়ীতে গেছি, দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্র দেখেছি একই চিত্র। মনে হল, এটিই ইরানের রীতি। দেখলাম ড. রুহানী সাহেবের পরিবারের অনেকেই তাঁর আগমনের জন্য অপেক্ষায়। আমরা সবাই বসার একটি ঘরে চারপাশ ঘিরে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম। মাঝে বিছানো হলো দস্তরখানা। ফার্সিতে দস্তরখানকে বলা হয় সোরফে। জনাব রুহানীর পিতা ও তার ভাইয়েরাও আসলেন। তাদের সামনে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। সবাই আমাকে খোশআমদেদ বললেন, কিছু প্রশ্নও করলেন। দোভাষীর কাজ করছিলেন জনান রুহানী। জনাব রুহানীর পিতা হাজি আসাদুল্লাহ ফরীদুন একজন ধর্মভীরু ব্যক্তি,স্থানীয় বাজারে তাঁর মসলাপাতির দোকান। ব্যবসার পাশাপাশি দেশের রাজনীতিতেও তার গভীর আগ্রহ। শাহ-বিরোধী ও ইসলামপন্থি হওয়ায় শাহের আমলে তাঁকে বহুবার গ্রেফতার করা হয়। তিনি প্রথম গ্রেফতার হন ১৯৬২ সালে।

ড. হাসান রুহানী ধর্মীয় শিক্ষার শুরু সেমনানের এক মাদ্রাসায়। এরপর তিনি কোম নগরীতে যান। তৎকালীন বড় বড় আয়াতুল্লাহদের কাছে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম খোমেনী তখন প্যারিসে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন। তখনও তাঁকে ইমাম বলা হতো না। তিনি পরিচিত ছিলেন আর দশ জন আয়াতুল্লাহর ন্যায় একজন আয়াতুল্লাহ রূপে।আয়াতুল্লাহ খোমিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোস্তাফা খোমেনী শাহের গুপ্ত ঘাতকদের হাতে শহীদ

5 / 10

ড. হাসান রুহানীর সাথে কিছুক্ষণের স্মৃতি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 29 September 2013 21:56 - Last Updated Sunday, 29 September 2013 22:34

হোন। তার মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপনের আয়োজন হয়েছিল আরক মসজিদে। সে জলসায় এ তরুন যুবক হাসান রুহানীই আয়াতুল্লাহ খোমিনীর নামের সাথে প্রথম ইমাম শব্দটি যুক্ত করে দেন।এরপর থেকে অন্যরাও তাঁকে ইমাম বলা শুরু করে। শিয়াদের কাছে ইমাম খেতাবটি কোন মামূলী বিষয় নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদাপূর্ণ খেতাব। কাউকে ইমাম বলার সাথে সাথে তাঁর প্রতি আনুগত্যের বিষয়টিও এসে যায়। তখন থেকেই ইমাম খোমিনী অন্যান্য আয়াতুল্লাহদের থেকে অধিক মর্যাদাবান ধর্মীয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। কোনরূপ নির্বাচন বা রেফারেন্ডাম ছাড়াই এভাবে স্বীকৃতি ও বৈধতা পায় তাঁর নেতৃত্ব। এভাবে ইরানের ইতিহাসের সে গুরুত্বপূর্ণ লগ্নটিতে জনাব হাসান রুহানী এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করেন। তখনও শাহের রাজত্ব। তার অতি কুখ্যাত সেক্যুরিটি বাহিনীর নাম ছিল সাভাক। শুধু ইমাম খোমেনীর পুত্রই নন, ডক্টর আলী শরিয়তির ন্যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী ব্যক্তি সাভাকের খুনিদের হাতে গুম হন। সাভাকের হিটলিস্টে জনাব রুহানীর নাম থাকায় আয়াতুল্লাহ বেহেশতী ও আয়াতুল্লাহ মোতাহারীর ন্যায় নেতাগণ জনাব রুহানীকে ইরান ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমানোর পরামর্শ দেন।

জনাব রুহানীর পৈতীক বাড়ীতে আমার অভিজ্ঞতা ভান্ডারে নতুন কিছু যোগ হলো। আমাদের সামনে আনা হোল ফলমূল ও চা। এই প্রথম দেখলাম ফলের ঝুলিতে শসা। শসা ইরানে ফলের মর্যাদা পেয়েছে। বাংলাদেশে জাংলায় ধরা বিশাল শসার তুলনায় এ শসাগুলো সরু ও ছোট। তবে স্বাদ অভিন্ন। বুঝতে বাঁকি থাকলো না, ড. রুহানী অতি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। একই অবস্থা সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. আহমদী নেজাদের। আহমেদী নেজাদের ছোট্ট বাসাতেও কোন খাটপালং বা
সোফা-টেবিল নাই। মেঝেতে বিছানা পেড়ে ঘুমোন। গণতন্ত্রের অর্থ তো এরূপ সৎ ও প্রতিভাধর যোগ্য মানুষদের জন্য ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে উঠার জন্য পথ করে দেয়া। কিন্তু সেটি যখন জিম্মি হয়ে পড়ে কোন মৃত নেতার অযোগ্য সন্তান বা স্ত্রীদের হাতে তখন কি তাকে গণতন্ত্র বলা যায়? জনগণও যখনসে জিম্মিদশাকে নিয়ে গর্ব করে

6 / 10

ড. হাসান রুহানীর সাথে কিছুক্ষণের স্মৃতি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 29 September 2013 21:56 - Last Updated Sunday, 29 September 2013 22:34

এবং সেটিকে গণতন্ত্র বলে চিৎকার করে তখন কি সে জনগণকে গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি বলা যায়? এরূপ পরিবারতন্ত্রের সাথে রাজতন্ত্রের পার্থক্য কোথায়? রাজতন্ত্রেও তো রাজার পাগল বা দুর্বৃত্ব পুত্র বা কন্যা রাজা বা রানী হওয়ার সুযোগ পায়।

ড. রুহানীর পিতার বাড়ীতে প্রায় ঘন্টা খানেক অবস্থানের পর আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো। সারা পথ ধরে শুরু হলো আবার বিবিধ বিষয়ে আলোচনা। উনার থেকে জানতে পারলাম, আমার কর্মস্থল গরমসারেও তিনি যাত্রা বিরতি করবেন। বললেন, সেখানকার জামে মসজিদে তাঁর বক্তৃতার পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠান। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার হাতে সময় হবে কিনা মসজিদের সে জলসায় থাকার। ঐ রাতে হাসপাতালে আমার কোন ডিউটি ছিল না। অতএব রাজী হয়ে গেলাম। তিনিও খুশি হলেন। মাগরিবের সময় আমরা মসজিদে গিয়ে পৌঁছলাম। মাগরিবের নামাজের পর তাঁর সভা। তিনি ফার্সীতে বক্তৃতা দিলেন। সে বক্তৃতা পুরাপুরি বুঝে উঠার মত ফার্সি তখনও আমি শিখে উঠতে পারিনি। ইরানে রাজনৈতিক জলসাগুলো কোন ময়দানে হয় না, মসজিদেই হয়। মসজিদই ইরানের ধর্ম, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সামজিকতার কেন্দ্রবিন্দু। নবীজীর আমলেও সেটিই ছিল রীতি। মসজিদ ভিন্ন তখন রাজনীতি চর্চার অন্য কোন প্রতিষ্ঠানই ছিল না। সাহাবায়ে কেরামদের আমলেও ছিল না। অথচ সেটি হতে দিতে রাজী নয় সেক্যুলারিস্টগণ। মসজিদে রাজনীতি চর্চাকে তারা বলে ইসলাম থেকে বিচ্যুতি। বলে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার। অথচ ইসলামের শিক্ষা রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নয়,বরং ইসলামের শরিয়তি বিধানসহ সকল বিধিবিধানকে দেশের রাজনীতি, আদালতে ও প্রশাসনে পূর্ণাঙ্গ ভাবে মেনে চলা। অর্থাৎ রাজনীতির পরিপূর্ণ ইসলামীকরণ।সেটিই তো নবীজী (সাঃ)র শিক্ষা। ইসলামের বিধিবদ্ধ বিধানকে রাজনীতিতে পূর্ণ ভাবে মেনে না চললে কি ইসলাম পালন হয়? আর সেটি করতে হলে রাজনীতির চর্চাও মসজিদ থেকেই শুরু করতে হয়। কারণ মসজিদই হলো আল্লাহর দ্বীনের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, সে সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানও। কিন্তু সেক্যুলারিস্টদের এজেন্ডা শুধু রাষ্ট্রের উপর তাদের দখলদারি প্রতিষ্ঠা নয়, বরং মসজিদের উপর দখলদারিও। তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক মসজিদগুলো দখলে নিয়েছিল সেখানে সরকারের বেতনভোগী ইমামদের বসিয়ে। ধর্মপ্রচারে সেসব সরকারি ইমামদের কোন স্বাধীনতা ছিল না, বরং অর্পিত দায়ভারটি ছিল সরকারের পক্ষ থেকে ছাপানো খোতবা জুম্মার নামাজে পড়ে শোনানো। ইসলাম চর্চার ক্ষেত্রে সেক্যুলারিস্টগণ যে কীরূপ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায় এ হলো তার নমুনা। বিলেতে দেখছি রাজনীতির চর্চা এদেশের চার্চে হয় না। সেটি হয় পাবে -যা আসলে মদ্যশালা। প্রতিগ্রাম ও প্রতিমহল্লায় রয়েছে মদ্যশালা। মানুষ এখানে শুধু মদ খেতেই আসে না, এখানে বসে টিভিতে খেলা দেখে, ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করে, রাজনীতি নিয়েও বিতর্ক করে। এমপিগণ এ মদ্যশালায় গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলে। এভাবে তারা জনসংযোগ ও নির্বাচনি জলসা করে। এটিই ব্রিটিশ রাজনীতির সেক্যুলারিজম। তাদের রাজনীতিতে চার্চের যেমন স্থান নেই, তেমনি স্থান নেই ধর্মের। কিন্তু সেটি তো ইসলামের শিক্ষা নয়। খৃষ্টান ধর্ম থেকে ইসলাম ভিন্নতর শুধু আক্বিদা-বিশ্বাস ও ইবাদতের ধরণে নয়, বরং রাজনীতিতের ইসলামের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও।

গরমসারের মসজিদে ঢুকে দেখলাম মসজিদের দেয়ালে অনেক পোস্টার। সেগুলির অধিকাংশই মূলত ইমাম খোমেনীর উক্তি। তেমন বহু উক্তি ক্যালিগ্রাফির ঢংয়ে ইরানের রাস্তাঘাটে শত শত দেখেছি। একই চিত্র দেখেছি ইরানের অন্যান্য মসজিদেও। মসজিদের পুরা মেঝে জুড়ে বিছানো অতি দামী দামী কার্পেট। অবাক হলাম মসজিদের গায়ে লটকানো ফটো দেখে। সেখানে শোভা পাচ্ছে ইমাম খোমিনীর ছবিও।দেখলাম জায়নামাজে বসে অনেকে চা খাচ্ছে। ইরানীরা চা খায় দুধ ছাড়া এবং চিনির টুকরো ভিজিয়ে ভিজিয়ে। চা বানানোর জন্য মসজিদের এক রুমে আলাদা আয়োজনও আছে। চা বানানোর সে বিশাল পাত্রটিকে

7 / 10

ড. হাসান রুহানীর সাথে কিছুক্ষণের স্মৃতি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 29 September 2013 21:56 - Last Updated Sunday, 29 September 2013 22:34

বলা হয় সামাভার। সে পাত্রে তৈরী চা ভলিন্টিয়ারগণ সমবেত মুসল্লিদের মাঝে ফ্রি বিতরণ করছে। দেখলাম কেউ কেউ আবার ধুমপানও করছে। ইমাম খোমেনী তখন জোরে শোরে শিয়া-সূন্নীর উর্দ্ধে উঠে মুসলিম একতা ও ভাতৃত্বের কথা বলছেন। ইমাম খোমেনীর একতার সে বানী পাশ্চাত্যের কাছে ভাল লাগেনি। ভাল লাগেনি সৌদি বাদশাহদের ন্যায় মুসলিম দেশের স্বৈরাচারি শাসকদের কাছেও। কিন্তু মসজিদে বসে আমার মনে হল, ঢাকা, করাচী, লাহোর ও কাবুলের মুসল্লীরা যদি মসজিদের ভিতরে এরূপ ছবি টানানো ও ধুমপানের খবর জানতে পারে তবে শিয়া-সূন্নীর একতা বিনষ্টের জন্য কি কোন অমুসলিম বা বিদেশী শত্রুর প্রয়োজন পড়বে?

ড. রুহানীর বক্তৃতা শেষ হলো। বক্তৃতার পর শহরের গণ্যমান্য লোকদের সাথে কিছুক্ষণ বসলেন। তারপর প্রস্থানের উদ্যোগ নিলেন। আমাকে বল্লেন, রাতে গরমসার শহরেই তাঁর দাওয়াত আছে। আমাকেও তিনি দাওয়াত দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আমি যেতে রাজী আছি কিনা। আমার পরিবার তখনও ইরানে পৌঁছেনি, হাসপাতালের বাসায় একা একা থাকি। ভাবলাম, বাসায় ফিরে একাকী কি করবো? ড. রুহানীর সাথে থাকায় ইরানী পরিবার,সমাজ ও রাজনীতিকে ভিতর থেকে দেখার যে সুযোগ পেলাম সেটি আমার কাছে অতি মূল্যবান মনে হল। বহু অর্থ বহু সময় ব্যয়েও ক’জন এরূপ দেখার সুযোগ পায়? তাছাড়া বিনা কারণে দাওয়াত অগ্রাহ্য করাও তো সূন্নতের খেলাপ। অতএব রাজী হয়ে গেলাম। অতিশয় অবাক হলাম ড. রুহানীর মেজবানের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে। ড. রুহানীকে অভ্যার্থনা জানানোর জন্য ঘর থেকে তাঁর মেজবানগণ বেরিয়ে এলেন। জনাব রুহানী তাঁর সমবেত আত্মীয়দের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এই বলে, ‘ইনি আমার ফার্স্ট কাজিন’। তারপর বল্লেন, “ইনি এ শহরের নাপিত।” আমি তো অবাক। সে এক বিশাল কালচারাল শক। আমি ভদ্রলোককে চিনতাম। কারণ, আমি গরমসার শহরে আসার পর তাঁর দোকানে চুল কাটাতে গেছি। কিন্তু সে যে তাঁর কাজিন সেটিই আমার বিস্ময়ের কারণ। তাঁর কাজিন যে নাপিত সেটি বলতে ড. রুহানীর সামান্যতম সংকোচও হলো না। ভাবলাম, আমার দেশে হলে ব্যাপারটি কেমন হতো? কেউ কি তার এমন আত্মীয়কে পরিচয় করিয়ে দিত? তাছাড়া প্রশ্ন হলো, কোন মুসলমান সন্তান কি নাপিতের পেশা গ্রহন করতো? বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষে পথে বসে ভিক্ষা করতে লজ্জা করে না, কিন্তু ক’জন পেশা রূপে নাপিতের কাজ করতে রাজী? বাংলাদেশে এ কাজ করে নিম্মশ্রেনীরা হিন্দুরা। মুসলমানদের মধ্যে যারা এ কাজটি করে তারা অবাঙালী বিহারী। ইসলামে শ্রেনীভেদ, জাতিভেদ ও বর্ণভেদ হারাম। হারাম হলো কারো কোন কাজ বা পেশাকে ঘৃনা করা। আর সবচেয়ে ঘৃনার কাজ হল ভিক্ষা করা। অথচ বাঙালী মুসলমানগণ নিজেদের ধর্মভীরু রূপে গর্ব করলেও ধর্মের এ মৌল শিক্ষাটিকে তাদের আচরণে স্থান দেয়নি। তাদের চেতনার মাঝে এখনও রয়ে গেছে হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার। ফলে এখনও রয়ে গেছে হিন্দুদের ন্যায় ডোম, মেথর, নাপিত, মুচীর কাজকে ঘৃনা করার সংস্কৃতি। অথচ ইরানের কোন গ্রামে বা মহল্লায় কোন ডোম-মেথর নাই। সবাইকে নিজ নিজ পায়খানা নিজ হাতে পরিস্কার করতে হয়। অথচ বাংলাদেশের চিত্রটাই ভিন্ন। পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করবে তবুও কোন বাঙালী মুসলমান এসব কাজকে নিজের পেশা রূপে গ্রহন করবে না। যেন একাজ করার জন্যই জন্ম নিয়েছে নিম্ন শ্রেণীর অচ্ছুৎ হিন্দুরা। হিন্দু সংস্কৃতির সাথে বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি এখানে একাকার হয়ে গেছে। অথচ একটি জনগোষ্ঠির সংস্কৃতি থেকেই পরিচয় মেলে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসটি জনগণের চিন্তা ও চরিত্রে কতটা পরিশুদ্ধি বা সংস্কার এনেছে সেটির।তাই জনগণের ঈমানের পরিমাপটি পাওয়া যায় তাদের সংস্কৃতি থেকে।এমন হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি নিয়ে কেউ ইরানে গেলে ‘কালচারাল শক’এর শিকার না হয়ে উপায় নেই। ইসলামি সংস্কৃতির মধ্যে যাদের বসবাস তারাও বিস্মিত হবে বাংলাদেশে এসে।

ড. হাসান রুহানী যে শুধু মাদ্রাসা-শিক্ষিত আলেম -তা নয়। তিনি ১৯৭২ সালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জুডিশিয়াল ল’র

8 / 10

ড. হাসান রুহানীর সাথে কিছুক্ষণের স্মৃতি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 29 September 2013 21:56 - Last Updated Sunday, 29 September 2013 22:34

উপর স্মাতক ডিগ্রি নিয়েছেন। এবং কন্সটিটিউশনাল ল’এর পিএইচড করেছেন গ্লাসগোর ক্যালিডোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেটি ১৯৯৯ সালে -যখন তিনি কাজ করছিলেন ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সেক্যুারিটির সেক্রেটারির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদে। সে বছরেই তথা ১৯৯৯সালে তিনি নির্বাচিত হন ইরানের অতি মর্যাদাবান প্রতিষ্টান মজলিসে খুবরাগান বা এক্সপার্ট কাউন্সিলের সদস্য রূপে। এ মজলিসের কাজ হলো পার্লামেন্টে গৃহীত আইনের উপর নজরদারি রাখা। পার্লামেন্টের সদস্যদের আইন প্রণোয়নের অধিকার থাকলেও আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত শরিয়তি বিধানের বিরুদ্ধাচারনের কোন অধিকার নেই। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র থেকে ইসলামের শুরাভিত্তিক গণতন্ত্রের এখানেই মূল পার্থক্য। জনাব রুহানী পার্লামেন্টের ডিফেন্স ও পরারাষ্ট্র নীতি বিষয়ক কমিটির প্রধানের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি যে শুধু রাজনৈতীক অঙ্গণের যোদ্ধা তা নয়,ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধের ফ্রন্ট লাইনেও অস্ত্র ধরেছেন। অংশ নিয়েছেন ইরাকের অধিকৃতি থেকে খুররম শহর নামক নগরটিকে আযাদ করার যুদ্ধে।সে যুদ্ধে বীরত্বের জন্য তিনি সর্বোচ্চ “নাছর” পদকটি লাভ করেন। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫ সাল অবধি ইরাক-ইরাক যুদ্ধের সময় তিনি সশস্ত্র বাহিনীর ডিপুটি কমান্ডারও ছিলেন। লক্ষণীয় হলো, এরূপ নানা ব্যস্ততার মাঝে তিনি লেখাপড়ার কাজও চালিয়ে গেছেন। মনযোগ দিয়েছেন দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধনেও। তিনি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়েরও একজন ট্রাস্টি। অংশ নিয়েছেন গবেষণার কাজেও। ১৯৯২ সাল থেকে কাজ করছেন সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক রিসার্চের প্রধান রূপে। কি শিক্ষা, কি রাজনীতি, কি যুদ্ধ, কি কুটনীতি, কি গবেষণা -সর্বক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছেন সর্বশক্তি নিয়ে।এরূপ ব্যক্তিগণ যখন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হয় তখন সে দেশ যে পৃথিবীর মঞ্চে নিজের জন্য গৌরবময় স্থান করে নিবে সেটিই কি স্বাভাবিক নয়? বাংলাদেশের অর্ধেক জনশক্তি নিয়ে এজন্যই ইরান আজ গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।

“ইনসানে কামেল” ইসলামে একটি বহুল প্রচলিত প্রতিশব্দ। কামেল শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ। শিক্ষা, কর্ম ও ইবাদতের অঙ্গণে জীবনকে শুধু একটি ক্ষেত্রে সীমিত রাখলে সে কামালিয়াত বা পরিপূর্ণতা আসে না। সে জন্য তাকে যেমন নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হয়,তেমনি জীবন যুদ্ধের নানা রণাঙ্গণে অংশও নিতে হয়। এভাবেই ঈমানদারের জীবনে কামালিয়াত বা পূর্ণ আসে। এটিই নবীজীর মহান সূন্নত। নবীজী (সাঃ)শুধু সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমই ছিলেন না, ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দায়ী বা ধর্মপ্রচারকও। ধর্মের বানী নিয়ে বহু জনপদে ঘুরেছেন। তিনি ছিলেন রণাঙ্গনের জেনারেল। ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট রাষ্ট্রনায়ক। ছিলেন আদর্শ পিতা, আদর্শ প্রতিবেশী ও আদর্শ ব্যবসায়ী। যারা নবীজী (সাঃ)র আদর্শের অনুসারি হতে চায় তাদের সামনে তাই বহুমুখি কাজে আত্মনিয়োগের বিকল্প নাই। সাহাবাগণের মধ্যে সে কামালিয়াত বা পূর্ণতা অর্জনের বাসনা ছিল প্রবল। ফলে সে সময় মুসলিম সমাজে নানামুখি উন্নয়ন ঘটেছে। তখন দেশে শুধু মসজিদ-মাদ্রাসার সংখ্যাই বাড়েনি,কৃষি, শিল্প,বিজ্ঞান ও সামরিক ক্ষেত্রেও বিপুল বিপ্লব এসেছে।উচ্চতর সভ্যতা তো এভাবেই নির্মিত হয়। ড.হাসান রুহানীর মাঝেও সে বাসনাটি যে অতি প্রবল ছিল সেটি বুঝা যায় তার শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের বহুমুখীতা দেখে। অথচ বাংলাদেশে কত আলেম সারা জীবন শুধু মসজিদের ইমামতি বা মাদ্রাসার শিক্ষাকতা করেই জীবনটি শেষ করছেন। ধর্মের লেবাসধারি অধিকাংশ মানুষ নিজেদের ধর্মকর্মকে সীমিত রেখেছেন শুধু নামাজ-রোযা ও হজ-যাকাতের মাঝে। দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে তারা যেমন মাঠে নামেন না, তেমনি আল্লাহর শরিয়তি বিধান আস্তাকুঁরে গিয়ে পড়লেও তা নিয়ে মাথা ঘামান না। তাদের জীবনে যেমন জিহাদ নেই, তেমনি ইসলামকে বিজয়ী করার কোন রাজনীতিও নাই। কোন জ্ঞানচর্চা বা বুদ্ধিবৃত্তিও নাই। আগ্রহ নাই নিজে শেখা ও অন্যদের শেখানোয়।বহু আলেমের অবস্থা তো এমন যে পয়সা না দিলে তারা মুখই খোলেন না। অথচ কোরআনের জ্ঞান বিতরণ করতে গিয়ে নবীজী (সাঃ)রকোন অর্থপ্রাপ্তি ঘটেনি। তাঁকে বরং কাফেরদের হাতে পাথর খেতে হয়েছে। এরপরও ভাবেন,তারা নবীজী (সাঃ)র সূন্নতের অনুসারি! প্রশ্ন হলো,এমন মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধিতে শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বও যদি ভরে যায় তবুও কি তাতে ইসলামের কোন বিজয় আসবে? কল্যাণ হবে কি মুসলমানের?

9 / 10

ড. হাসান রুহানীর সাথে কিছুক্ষণের স্মৃতি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 29 September 2013 21:56 - Last Updated Sunday, 29 September 2013 22:34

বিস্ময়ের বিষয় শুধু ড. রুহানীর প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্টৃত হওয়াটি নয়। বরং অধিক বিস্ময়ের বিষয় হলো যারা তাকে নির্বাচিত করেছে সে ভোটাদাতাদের রুচী, দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা। একটি দেশের জনগোষ্ঠির রুচী ও প্রজ্ঞা তো ধরা পড়ে তাদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বা এমপিদের চরিত্র দেখে। যে দেশে চোরডাকাত, খুনি,গণতন্ত্র হত্যাকারি বাকশালী,ব্যাভিচারি, স্বৈরাচারি, মিথ্যুক ও দূর্নীতিপরায়নরাও বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয় এবং জাতির পিতার আসন পায়,সে দেশের সাধারণ মানুষের অপরাধটিও কি কম? এমন দেশ বার বার দুর্বৃত্তদের দখলে যাবে সেটিই কি স্বাভাবিক নয়? ডাকাত পাড়ায় কোন ভাল মানুষ সর্দার হতে পারে না। সে জন্য নিষ্ঠুর ডাকাত হওয়াটি জরুরী। এমন নিষ্ঠুর ডাকাত যখন গ্রামবাসীর ভোটে সর্দার নির্বাচিত হয় তখন কি সন্দেহ থাকে সে গ্রামবাসির চরিত্রের পচন নিয়ে? তাদের চরিত্রের পরিমাপে কি তখন আর কোন গজকাঠির প্রয়োজন হয়? বাংলাদেশ তো তেমনি এক দুর্বৃত্তকবলিত দেশ। এমন একটি দেশ দুর্বৃত্তিতে বিশ্বে বার বার চ্যাম্পিয়ান হবে সেটিই কি স্বাভাবিক নয়? গণতন্ত্রের অর্থ শুধু বার বার নির্বাচন নয়, বরং সেটি হলো যোগ্য মানুষদের নির্বাচনে জনগণের সামর্থ। সে সামর্থ ছাড়া গণতন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য। বাংলাদেশের মানুষের সে সামর্থ কি আদৌ অর্জিত হয়েছে?

মানুষকে শুধু হিংস্র পশু,বিষধর শাপ ও বিষাক্ত পোকামাকড়কে চিনলে চলে না, তাকে ইসলামের শত্রু ও সমাজের দুর্বৃত্তদেরও চিনতে হয়। একটি দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি হয় এরূপ দৃর্বৃত্তদের চিনতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে। হিংস্র পশু,বিষধর শাপ ও বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড়ে ক’জন মারা পড়ে? কিন্তু দুর্বৃত্তগণ ক্ষমতা পেলে বিপদে পড়ে সমগ্র জাতি। মানুষ তখন পথেঘাটে গুম বা খুন হয়। লুন্ঠিত হয় দেশের অর্থভান্ডার।দেশ তখন ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত হয়। তখন নেমে আসে আল্লাহতায়ালার আযাব। তাই মহান আল্লাহতায়ালা এমন দুর্বৃত্তদের শুধু চেনাটাই ফরজ করেননি, তাদের নির্মূল করাটাকেও ফরজ করেছেন। ইসলামে জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে তো সে লক্ষ্যেই। নির্মূলের সে কাজটি করতে গিয়েই তো শতকরা ৬০ ভাগের বেশী সাহাবী শহীদ হয়ে গেছেন। গণতন্ত্র তো তখনই সফল হয়,যখন জনগণ সে সামর্থ পুরাপুরিটি অর্জন করে। তখন প্রাতিটি নির্বাচন ইসলামের শত্রু নির্মূলের কাজে ধারালো হাতিয়ার রূপে কাজ করে। খলিফায়ে রাশেদার আমলে তো সেরূপ গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। ফলে তখন রাজতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র নির্মূল হয়েছিল এবং নির্বাচিত হয়েছিলেন সমাজের সবচেয়ে যোগ্যবান ব্যক্তিগণ।সেটি না হলে গণতন্ত্রের পথ ধরে হিটলার,মুজিব ও হাসিনার ন্যায় ফ্যাসিবাদী খুনিদের হাতে দেশ অধিকৃত হয়। তখন দেশে গ্যাস চেম্বার বা শাপলা চত্বরের গণগত্যা নেমে আসে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নামে গণদুষমণগণ বার বার নির্বাচিত হচ্ছে ও রাজপথ বার বার রক্তাত্ব হচ্ছে তো সে ব্যর্থতার কারণেই। ২৯/০৯/১৩

10 / 10